হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

১০ম পর্ব (প্রথম অংশ)

দিগন্ত বড়ুয়া

Yes, 'n' how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

*(Bob Dylan, B*lowin' in the wind*)*

লোংগা হত্যা কান্ডের কথা কম বেশী পৃথিবীর সচেতন সব মানুষই জানে। এ নিয়ে অনেক অনেক লেখালেখি হয়েছে। এখন হয়তো কারো প্রশ্ন জাগবে না - এটা কি ও কোথায়? তারপরেও সবার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য। লোংগা খাগড়াছড়ি জেলার একটি গ্রামের নাম। যেখানে ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলার বর্বর মুসলিম ও এছালামী যোশ বাহিনী নারকীয় হত্যা লুঠ ধর্ষন বৌদ্ধ মন্দির ভাঙ্গা সাধারণ সংখ্যালঘুদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় অমানবির কর্ম যজ্ঞে লিপ্ত হয়েছিল। হত্যার সংখ্যা ১৩০০ এর কিছু বেশী বিভিন্ন সুত্র মতে। তবে বাংলার যোশ বাহিনী সে সংখ্যা ১৩৮ এর বেশী পায়নি। কেন এই হত্যা কান্ড? যারা জানেনা, তার কারণ জানার আগ্রহ থাকবে মানুষের। সুত্র ১: পাহাড়ী ও বাঙ্গালী বালকের মধ্যে মারামারিকে কেন্দ্র করে প্রথমে ফুসে উঠতে থাকে যোশ বাহীনি। এই জের ধরে তারা কারণ খুজতে থাকে কি করে পাহাড়ীদের সাথে একটা বিবাদের সুত্র পেতে পারে। তারই সুত্র ধরে বালকটির প্রতিবেশীনির উপর প্রতিশোধ নেয়। তারপর.. সুত্র ২: পাহাড়ী যুবতী পাহাড়ে কাজ করে প্রতিদিন বাড়ী ফেরার সময় তাকে কিছু সেটেলার এছালামী যোশ ওয়ালা নানা ভাবে উত্যক্ত করতো। এইদিন সেই যুবতী কাজ করে বাড়ী ফিরছে। পথিমধ্যে সেই গ্রামে পুনর্বাসিত সেটেলার এছালামী যোশ ওয়ালাদের দ্বারা সে ধর্ষিত হয় । কাজ থেকে ফেরার সময় হাতে যে তাগলটি ছিল সেটা দিয়ে কুপিয়ে একজন ধর্ষককে হত্যা করে। বাকীরা পালিয়ে যায়। এই পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন সন্ত্রাসের সৃস্টিকেন্দ্র মসজিদে গিয়ে মাইকে প্রচার করতে

থাকে, পাহাড়ীরা যোশ ওয়ালাদের উপর আক্রমন করেছে। আর তখনই সেটেলার যোশ ওয়ালা বাহীনি আর্মি আনসার কে খবর পৌঁচায়ে তাদেরকে সাথে নিয়ে সশস্ত্র হামলায় হত্যা কান্ড শুরু করে। যখন ঘটনাটি শুরু হয়- উৎসব শুরুর আর মাত্র একদিন বাকী, মনে প্রাণে আনন্দের ঈশারা। অথচ আগের দিনই হত দরিদ্র বন্দি নিরস্ত্র শত শত মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়লো একদল এছালামী যোশ হায়েনা বাহিনী। নিহত হল শিশু, বৃদ্ধ যুবক, যুবতী, নারী পুরুষ। ভর-দুপুরের অসহ্য গরমে ক্লান্ত অসহায় মানুষ গুলো যে সময়টায় আনন্দময় অনুষ্ঠানের ঘন্টাধ্বনির প্রহর গুনছিল-হামলা শুরু হলো ঠিক এই সময়েই। কারো বা খোলা ঘর কারো বা ঘরে ছিটকিনি দিয়ে আগুন ধরানো হলো। শত শত ক্ষুদ্র কুঠি মুহুর্তের মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। আগুনে পুড়লো মানুষ, কারো হাত কারো পা কারো মাথা, কারোবা শরীরের বিভিন্ন অংশ। লাঠি সোটা দা বটি বন্দুক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল একদল 'শান্তির ধর্মের' যোশ বাহীনি। এই হামলায় শত শত পাহাড়ী নিহত আহত হয়। আর যারা জীবণ নিয়ে পালাতে পেরেছে তারা প্রথমে জঙ্গলে তারপর পাহাড়ী পথ ধরে ভারতের ত্রিপুরায় শরনার্থী আশ্রয় কেন্দ্রে। একটি প্রাণোচ্ছল পাহাড়ী অঞ্চল মাত্র একটি দিনের পরিপূর্ণ তান্ডবলীলায় নিরব হয়ে পরে। কথা ছিল ১২ই এপ্রিল থেকে পাহাড়ীরা সামাজীক সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান 'বৈসাবি' শুরু করবে তিনদিনের জন্য। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে। কিন্ত তা কি আর হলো? ত্রিপুরাদের *বৈসুক*, মার্মাদের *সাংগ্রাই* ও চাকমাদের *বিঝু*, এই তিনটি অনুষ্ঠানের আদ্যাক্ষর দিয়ে সংক্ষেপে বৈসাবি। চৈত্রের শেষ দুইদিন ফুল বিজু, মুল বিজু আর পয়লা বৈশাখের দিন সব পাহাড়ীর মিলন মেলা। ৩০শে চৈত্রের দিন ভোর সকালে পাহাড়ী হ্রদে ফুলদিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়, তারপর শুরু হয় আনন্দের বন্যা। কেউ নতুন জামা কাপড় পরে বেড়াতে বের হয় কেউবা পাহাড়ের ঢালে বা কোন সামান্য সমতল জায়গা খুজে বিভিন্ন নাচ গানের আসর বসায়। প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খায়। ১৯৯২ সালের ১২ই এপ্রিল সকাল পর্য্যন্ত ভেবেছিল সবাই এবারও আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবে জীবনের একটি ক্ষণের জন্য হলেও। তা কি আর হল?

সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকা থেকে কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা কর্মী গিয়েছিল। তারা আর পারেনি আনন্দ নিতে। এত বড় হত্যা কান্ড ঘটালো, তবুও সরকার নিরব নিশ্চুপ ছিল। কোন তদন্ত হয়নি, এই অমানবিক হত্যা-নির্যাতনের পরও। পরে পরে যখন দেশে বিদেশে খবর ছড়িয়ে পরে তখন মুখ ঢাকতে কিছু কিছু 'রাজনৈতিক ডাকাত' গিয়েছিল সেই এলাকা দেখতে, তবুও সাধারণ

কোনো মানুষকে প্রবেশ করতে দেয়নি সেই অঞ্চলে। আন্তর্জাতিক ভাবে ধামাচাপা দেবার জন্য গাল ভরা আশ্বাস দিয়ে আসে, ডাকাতেরা ফিরে এসে বলেছিল ঘটনা ঘটেছিল কিন্ত '*খুবই সামান্য*'। ১৩০০ বেশী মানুষ মরে গেলেও তাদের চোখে ঘটনা হয় 'খুব সামান্য', তাই ভারতের কোনো এক পত্রিকার সাথে ইংল্যান্ডের কোন এক পত্রিকাও প্রশ্ন করেছিল -'কত লোক মারলে ঘটনা অ-সামান্য হয়?'

Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?

এর জবাব কি কেউ দিতে পারবেন? বাংলাদেশের রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে যখনই ক্ষমতায় আল্লা বাহীনি ছিল তখনই সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরতা চালানো হয়েছে সব চেয়ে বেশী। যেমনটি বর্তমান তালেবানী বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে হচ্ছে প্রতিদিন।

ক্ষণ কালের শিক্ষিত তবে এখনো প্রকৃত অর্থে বর্বর বাঙ্গালী মুসলিমদের কিছু অংশ যখন না জেনে কলম হাতেনিয়ে খেলা করে, তখন সাধারণ মানুষের হাসি পায়। কথায় বলে '*দু দিনের বৈরাগী, ভাতেরে কয় অন্ন*'। বাংলাদেশের পার্বত্য বা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদীবাসীদের মুলতঃ একটি সাংস্কৃতিক সভ্যতা আছে আজ তা সংখ্যার পদ ভারে অবহেলিত। এদের ভাষা সংস্কৃতি উৎসব সম্পর্কে মুলতঃ বর্বর বাঙ্গালী ও প্রকৃত শিক্ষিত 'শহুরে' বাঙ্গালীরা যে কিছুই জানে না তার প্রমান যথেষ্ট রয়েছে। না জেনেও তাদের কোনো লজ্জাবোধ নাই। মাঝে মাঝে একটু আধটু জেনে কৃতার্থ করার ভান করে হয়তো অনেকে। ভাবখানা এই - ওদের আবার উৎসব কি আনন্দ কি ? জাতীয় বেতার বা সংবাদ মাধ্যম কোনোদিন অনুষ্ঠানতো দুরের কথা ছোট্ট একটি খবর ও দেয়না কোন সময়। তো এই না হলে কি উন্মাদ ধর্ম ব্যবসায়ী হওয়া যায়? তবুও **একটি কথা আবারও আমার বলতে হয়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যা কোনো রাজনৈতিক নয়, এটা প্রকৃত পক্ষে একটি ধর্মীয় সমস্যা।**

মাঝখানে একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে, মুসলিম প্রধান দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্ভীরা প্রতি পায়ে পায়ে নির্যাতিত। কেউ যদি মালয়েশিয়ার কথা বলতে চান তবে একটি কথা বলতে চাই, যে বিষয়ে বলছিলাম, মালয়েশিয়ার সংখ্যালঘুরা মালয়েশিয়ায় শিক্ষা, অর্থ বিত্ত তথা সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ন অগ্রসর মুল মালয়দের চেয়ে। তাই মনে করুন আজকে সেই দেশের সংখ্যালঘুদের সকালে আঙ্গুল দেখিয়ে কথা বলবে তো সন্ধ্যায় আর তার কাজটা থাকলো না, তখন

খাবে কি? জেহাদ কি করে করবে ? এই 'মাইর' ও কি এক প্রকারের মাইর নয় ? তারপরেও মালয় সরকার ও সংখ্যাগুরু জনগণ চেষ্টায় আছে বিভিন্ন ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর খড়্গ বসাতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে, তার বিনিময়ে হারাতে ও হচ্ছে অনেক। মালয়েশিয়া থেকে বড় বড় কোম্পানী গুলো চলে যাচ্ছে। আপনারা ভিন্নমতে দেখেছেন, দেড় মাস আগে আমিও বাংলাদেশের কোন দৈনিক অন লাইনে দেখেছি মালয়েশিয়া থেকে বড় বড় কোম্পানী গুলো চলে যাবার খবর। কেন চলে যাচ্ছে ? কারণ গুলো কি কেউ খুজেছেন ? খোঁজেন ? নির্ভরযোগ্য দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হয়তো শিল্প সম্বন্ধের জন্য অনুকূল নয়, তাই হয়তো। অপর দিকে অস্থিতিশীল দেশে বড়মাপের শিল্প কখনো যায়না। অন্য দিকে যাদের তেল আছে তারা মাদ্রাসা বানায় জঙ্গী বানায় জেহাদী বানায়, দিন শেষে হিসাবের খাতা নিয়ে বসলে দেখা যায় পুরা একটা ক্রিমানাল চক্র দেশে দেশে অশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন হয়তো বলে বসবেন কি কথার ভিতরে কি কথা বলে ফেলছি, না । আমি স্বজ্ঞানে বলছি। আপনারা কি জানেন বাংলাদেশ থেকে ও বড় বড় কোম্পানী গুলোর দোটানায় ঝোলার খবর ? হয়তো জানেন না। জানলে মৌলবাদিতা ত্যাগ করে দেশের দিকে, মানুষের দিকে মন দিতেন। ই পি জেড নামক যে বানিজ্যিক এলাকা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল তাও এখন লাওস ও কম্বোডিয়ার দিকে ধাবিত। জাপান কোরিয়া তাইওয়ানের ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত পরিবেশ বাংলাদেশ দিতে পারছেনা। এই শিল্পপতিদের ঘুষ দিয়ে প্রতিটি কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে এই অবস্থা। গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশে এই বছর ব্যবসা এসেছে মাত্র ২৯% ভাগ। কেন ? বেহেস্তের হুর পরির লোভে আকাশের পানে চেয়ে থাকা ও যোশের গরমে অন্যান্যরা হাফিয়ে উঠছে বলে হয়তো। বাংলাদেশে আরও একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কি ? বাংলাদেশের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানী গুলোর কর্তারা কিন্ত হয়তো ভারতীয় নয়তো ভিন দেশী। কেন জানেন ? আপনাদেরকে সাধারণ মানুষেরা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেনা নয়তো আপনাদের মাঝে যোগ্য লোক নাই বলে। আমার এই লাল লেখা গুলো আমার প্রসঙ্গের সাথে বিচ্ছিন্ন। তবুও পাঠকদের একটু ভাবনার খোরাক যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

যাক, আমার কথায় ফিরে আসি।

যদি সাধারণ ভাবে সবকিছুর উপর আলোক পাত করতে যাই তবে উৎসব করার মতো আর কি কোনো পরিবেশ আছে আজকের বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ? প্রতিটি ক্ষন হত্যা মৃত্যু ধর্ষন উচ্ছেদ নির্যাতন, নিপীড়ন ও নিদারুন ভয়ে এক একটি ক্ষণ কাটে। এই ভয়ার্ত জীবনে উৎসবের কথা কি মাথায় আনা যায়? তবুও বছরের পর বছর এই ভাবে যাদের জীবন চলে তখন তাদের আর কিছু করার থাকে বলে মনে হয় ? আজকের বাংলাদেশের প্রতিটি সংখ্যালঘুদের উৎসবকে মৃত্যুর সাথে এক করে নিয়ে কাটাতে হয় প্রতিদিন, যেন সচল জীবন দিয়ে অচল জনপদের দিকে ব্যঙ্গ ছোড়া হয় প্রতিটি ক্ষণে।

আমার প্রিয়জনকে হত্যা করা হয়েছে আর আমি কান্নাও করতে পারবো না? আমর জীবনের শেষ সম্বল কেড়ে নিয়ে গেছে আমি হাহাকার করতে পারবো না? আমার ভিটেমাটি কেউ জবর দখল করেছে, আমি কিছুই বলতে পারবো না? আমার শান্তির আশ্রয় একমাত্র ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে আমি কোনো অভিযোগ করতে পারবো না? আমার স্বজন হারানোর দুঃখ অন্যকে জানাতে পারবো না? এছালামী বর্বরদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবো না ?

—- না । আমি কিছুই করতে পারবো না। কাঁদতে পারবো না। কেউকে জানাতে পারবো না। কিছু বলতে পারবো না। কারণ ওৎ পেতে থাকা খুনি এছালামী বর্বরদের ভয়ে আমি কিছুই করতে পারবো না। মা শিশুদের নিয়ে হাটে , বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যুবতী সদ্য বিধবা মা কিছুই জানে না, কোথায় যাবে কি খাবে, কি করবে। ১৯ বছরের যুবতী ইন্দ্রা মা বাবা ভাই ভাইয়ের বৌ পরিবার পরিজন সব হারিয়েছে, কি ভাবে যেন সে বেঁচে গেছে। নিরাপত্তার জন্য গভীর জঙ্গল। এখন সে কি করবে কোথায় যাবে, কার আশ্রয়ে থাকবে কেউ জানে না, সে নিজে ও জানে না। কিপিলি ও তার স্বামী মহেন্দ্রের যে সম্বল ছিল তা হারিয়ে আত্নীয়ের বাড়িতে আশ্রিত, কোথায় যাবে কি খাবে কি করবে কিছু জানে না। বৃদ্ধ বাঁশী বরন ৭২ বছর বয়সে সবাইকে হারিয়ে মুখের কথা ও হারিয়ে ফেলেছে। যেখানে বাপ দাদার ভিটা ছিল তা আজ কিছু অংশ যোশ ওয়ালাদের বাড়ি, আর কিছু অংশ সন্ত্রাসের আড্ডাখানা মসজিদ। সে কি খায় কি ভাবে বেঁচে আছে কেউ কি বলতে পারবেন ? বৃদ্ধা প্রমিলার কাজ করার মতো শরীরে শক্তি নাই তাই সে একমাত্র নাতী নিয়ে ভিক্ষা করে, কারণ তার বাড়ি জ্বালানোর সময় তার ছেলেকে পিটিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করে আর তার ছেলের বৌকে ধর্ষন করে তার যৌনাঙ্গে বোতল ঢুকিয়ে দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে রেখে যায় আর আগুনে সেও পুড়ে যায়। লিখতে গেলে লিখতে হয় হাজার হাজার ঘটনা। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাই সময় সময়। তবুও ঠিক করেছি আমি লিখে যাব ধীরে ধীরে। এছালামী যোশ ওয়ালা বর্বর ঘাতক বুক ফুলিয়ে আমারই আঙ্গিনায় হেটে বেড়ায়, আমার যেখানে বাপ দাদার ভিটা ছিল সেখানে এখন তাদের আস্তানা। যোশ ওয়ালা এছালামী জন্ত বর্বর ঘাতকদের চোখে মুখে তৃপ্তির ছায়া, এছালামী যোশ ছড়িয়ে দিল আরো কিছু নিস্পাপ মানুষের ভূমিতে। নিহতের স্বজনেরা পালিয়ে বেড়ায়। একটু বসে কাঁদবে? কান্নার সেই জায়গাটি নাই। সেই সাহস ও নাই। তবুও কেউ যেতে পারবে না

তাদের কাছে। তাদের কাছে যাবার পথ রুদ্ধ। তারাই যেতে পারবে পোড়া আধ পোড়া সহায় সম্বল হীন মানুষের জনপদে যারা ফিরে এসে বলবে জীবন যাত্রা স্বাভাবিক, সংখ্যালঘুরা খুব সুখে আছে।

এই কণ্ঠ এই স্বর এই সূর আমি দেখেছি, আমি চিনে গেছি তাদের। আমি চিনি তাদের। এই তারা - যাদেরকে আমি যোশ ওয়ালা বলি। তারা বাংলাদেশের এছালামী যোশে মত্ত 'উন্মাদ মুসলিম'। যাদেরকে আমি মানুষের মত দেখতে বর্বর বন্য জন্তূ বলে জানি । যাদেরকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা উন্মাদ বেদুঈন আরবের পোষা জন্তূ হিসেবে জানে। কালের ক্রমায় যে জাতি একসময় কুকুর ছানার মতো লাথি খেয়ে বেঁচে ছিল আজ তারাই অন্য জাতী গোষ্টি সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর হায়েনার থাবা বসাচ্ছে। অথচ তাদেরই স্বজাতি কথিত শিক্ষিত দাবীদার চুপচাপ আনন্দ উপভোগ করে। কানে তুলা দেয়, চোখ লুকিয়ে রাখে। এ সব বর্বর জঘন্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সংখ্যালঘুদের জীবনে। তবুও কেউ কিছু দেখে না, কিছু শোনে না, কিছুই বুঝেনা। মানুষ শিখে, জন্তূরা শুধুই জন্তূ তাই শিখতে পারেনা। এই জন্তূদেরই লালন পালন কারী শাসক শ্রেনী ও কথিত শিক্ষিতেরা ক্ষমতার বলে বলিয়ান, সুশীল সদস্য রুপী মুলতঃ সন্ত্রাসের সৃষ্টিকারীরা কাগজের পাতার ও বেতার টিভির তৈরী খবর প্রচার করে দেয়, ভেবো না, সব ঠিকঠাক- চিন্তার কারণ নাই। ক্ষণ কালে শিক্ষিত বাংগালী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সেই খবর ও লেখা দেখে সন্তূষ্ট মনে খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যায়। হয়তো খুশীতে লাফদিয়ে উঠে , আল্লার দেশে অনাবিল সুখের নদী বয়ে চলেছে। কিন্ত আমরা যে দিনের পরে দিন নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি তা তারা দেখে ও না দেখার ভান করে। আমি জাতি-বিদ্বেষী কখনও ছিলাম না, বর্ণবাদী নই - বে-ওয়ারীশ কুকুর ছানার মতো লাথি খাওয়া বাঙ্গালী বর্ণবাদের শিকার নিজেরাই আজকে বর্ণবাদীতে পরিনত হলো। বাংলার বর্বরবাদী মুসলিম তথা এছালামী যোশ ওয়ালাদের স্বরুপের পরিচয়ে পাহাড়ের ঢালে ঢালে হত্যা ধর্ষন উচ্ছেদ অত্যাচার নিপীড়ন রক্তপাত চলতে থাকে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জীবন যেন - জীবন আমাদের নয় , আমাদের জীবন তাদের হাতে। এই তারা কারা ? বাংলার যোশ ওয়ালা এছালাম বাহীনি। আমাদের পাশে এসে প্রতিবাদ করার কেউ নাই, আমাদের বিপদে রক্ষা করার কেউ নেই, তবে মায়া কান্না করার অনেকে আছে। এই মায়া কান্নার তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে স্বস্তি নেয় , আর আমরা নিধন হই প্রতিদিন। আবার যোশ ওয়ালাদের কেউ

কেউ আমাদেরকে পুঁজি করে জমজমাট ব্যবসাও জমিয়েছে ভালো। তবুও আমাদের হত্যা চলছে দিনের আলোয়। তবুও আমরা বলতে পারবো না, কওয়া যাবে না। কারণ আমাদের জীবন আমাদের নয়। তারাই বলতে পারে, জীবন আমাদেরই যারা সংখ্যালঘুদের হত্যা, হুমকি, ধর্ষন, উচ্ছেদ, উৎপিড়ন নিপীড়ন করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অতি সামান্য কিছু সংখ্যক বাদে মুসলিম ও মুসলিম ধর্ম মানেই অত্যাচার নির্যাতন সম্বলিত এক সন্ত্রাসীর দল। কিছু দশক ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করছে বলে আমি বলছি না, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ভারত বর্ষে তথা এই উপমহাদেশে যখনই যোশ বাহীনির আগমন তখন থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে অত্যাচার খুন সন্ত্রাসের জন্ম। আর এই তাদেরই বংশধর হয়ে এই যোশবাহীনি কি এত ভালো হবে তার কাজে প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিপক্ষ ও পরিপুর্ন প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু নিধনের দলবল একমাত্র বৃহৎ অংশের মুসলিম জনগণ, যারা সক্রিয় ও নিরবে ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। তার সাথে উন্মাদনা ব্যবসায়ী সরকার এছালামী অত্যাচারিদের জোগান দাতা। কেননা বৃহৎ অংশে দলভারী উন্মাদ অত্যাচারী যদি না হয় তবে দিনের পর দিন এই ভাবে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয় কি ভাবে তা কি কারো কাছে প্রশ্ন হবার কথা নয়? এই সংখয়ালঘু নির্যাতনের প্রতিকারে কয়জন ও প্রতিকারে প্রতিরোধী কতজন তা কি আর কেউকে গুনে বলতে হবে ? আমার মনে হয় সচেতন প্রতিটি মানুষই গভীর ভাবে চিন্তা করলে পেয়ে যাবেন। যাদের সমাজ ব্যবস্থা হত্যা নিগৃহিততা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অত্যাচারের উন্মাদনা সম্বলিত তারা সহজেই সংস্কারের পথে অথবা মানব সমাজে আসার কথা নয়, তবুও এদের থেকে যারা বেড়িয়ে আসতে পেরেছেন তাদের স্বগুনে পরিচয় দেখা যায়। আর যারা পারেনি পারছেনা তারা বেদুঈন জন্তূ হিসেবে প্রতিক্ষন ঐতিহ্যের চেহারা দেখায়। এই দেখা দেখে কেউ সম্বল হারায় কেউ জীবন হারায়।

—বেশ কিছু তথ্য উপাত্ত থেকে সংগ্রীহিত। পুরাটা তুলতে না পারলেও কিছু তুলছি এই লেখায়। তবে এর মাঝে আমার ব্যক্তিগত উদ্দোগেও কিছু তথ্য সংগ্রীহিত আছে, তাও আমি যোগ করছি। ১৯৭৬ সালের শেষদিকে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বোনা হয়। ক্ষণ কালে এই বীজ ফল দিতে শুরু করে। মুলতঃ স্বাধীনতার মাত্র কয় বছরের

মাথায় রাজাকার বাহীনি যে এই ভাবে দেশে স্বমূলে বসে যাবে তা কখনো ভাবি নাই। হয়তো সামান্য সচেতন মানুষেরা বলে উঠবে এই ভাবেই। কিন্ত একটু পেছনের দিকে তাকালে পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায় বাংগালী মুসলিম আসলে কি? কি তাদের লক্ষ্য ছিল বা কি তাদের বর্তমান লক্ষ্য? সেই বিষয়ে হয়তো কোন দিন সময় হলে আলোচনা করা যাবে।

খুব সম্ভবত ১৯৭৭ সালের প্রথম দিকের কথা। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি ও আরও এক নাম ভুলে যাওয়া গ্রামে প্রথম হামলা চালায় বাংলাদেশ সেনা বাহীনি। হামলার কারণ পাহাড়ীদের কাছথেকে তাদের ফলানো সশ্যাদি চায়, কেউ দিতে রাজী না হওয়ায় উল্লেখিত গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে ৫০জন পুরুষ ও ২৩ জন মহিলাকে শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আর তাদের বাড়ী ঘর পুড়েদেয়া হয়। উপজাতীয় প্রতিনিধিরা এই খবর বাংলাদেশের সংবাদপত্রের কাছে পাঠালে তারা সেই খবর ছাপেনি।

১৯৭৭ সালের জুন কি জুলাই মাসের কথা, ফরোয়ার কোন এক গ্রামে চাকমা মারমা ত্রিপুরা ও মাত্র ৭ পরিবার বড়ুয়া বাস করতো। সবাই যার যার মতো সুখে দুঃখে দিনাতিপাত করত। সেটেলার এক জঙ্গী জন্তু ত্রিপুরা মেয়ের সাথে প্রেমের অভিনয় করে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমার এক পরিচিত জন। মেয়েটিকে বলে তোমাকে যোশ বাহীনি হতে হবে। মেয়েটি বলে তুমি আমার চেয়ে তোমার যোশকে বেশী ভালোবাস। আমাকে নয়। তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালোবাস তবে তুমি আমার সাথে বৌদ্ধ হয়ে যাও। পারবে? তখন যোশ ওয়ালা বিভিন্ন ভাবে ফাঁদ পাততে থাকে। কোন ভাবে কিছু করতে না পেরে(কারণ তখন তত বেশী যোশ ওয়ালা ছিল না পাহাড়ী অঞ্চলে) আর্মি নিয়ে আসে । অনেক গর্জন কুর্দন করে চলে যায়। একরাতে হঠাৎ সেই পাড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয় কোন এক বাড়ীতে। আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালাবার সময় ধরেফেলে সেই যোশ ওয়ালা ও তার সহযোগীকে। তাদের ধরে স্থানীয় প্রশাশনের কাছে দিলে তারা বলে ঘর পুড়ে দিয়েছে কি হয়েছে, আবার বাঁধলে ঠিক হয়ে যাবে। তারও তিন দিন পরে দিন দুপুরে যোশ বাহীনি ও আর্মি মিলে সেই পাড়াটা জ্বালিয়ে দেয়। এলোপাতারি গুলি চালায়। সেই গুলিতে সুভাস বড়ুয়া নামে একজন তরুন মারা যায় ও আটজন গুলিবিদ্ধ হয়। কেউ চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরন করে। কেউ পালিয়ে ভারতে কেউ পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়। যোশ ওয়ালারা সেই পাড়াটি দখল করে।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ । হঠাৎ হামলা চালিয়ে যোশ ওয়ালা এছালামী বাহীনি ও আর্মিরা মিলে উত্তর পূর্ব রাঙ্গামাটির কিছু গ্রাম বিলিন করে দেয়। শত শত লোককে আটক করে অকথ্য নির্যাতন চালায়। তার কারণ আজকের দিনটি পর্যন্ত জানা জায়নি। তবে আমরা জানি, বা আমি জানি, সেই গ্রাম গুলোতে এখন যোশ ওয়ালারা বসবাস করছে।

১৯৭৮ সালের শেষদিক থেকে ১৯৭৯ সালের প্রথমদিক পর্য্যন্ত রুমা সেনানীবাসের (বর্তমানে উত্তর রুমা) {তার মানে বুঝতে পারার জন্য বলছি যে যেখানে একটি আর্মি ক্যাম্প ছিল সেখানে আজ দুটি} আর্মি ও যোশ বাহীনি মিলে ক্রমান্বয়ে অত্যাচার চালিয়ে দুমদুম্যা এলাকার ৫০টি গ্রামের ২৪টি গ্রামকে পরিপূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেখানে আজ এছালামী যোশ বাহীনির লোক জনের বসবাস। এই ২৪টি সংখ্যালঘু গ্রামের ধ্বংসের কারণ কি রাজনীতি নাকি এছালামী বাহীনির ঝান্ডা নিয়ে চির চেনা মুখ দেখিয়েছিল? এই উত্তর যোশের আড়ালে থাকা শিকার ধরার প্রতিক্ষিত জন্তুর জানার কথা নয়। তবে আমরা জানি।

৯ই জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে সুবলং উপত্যকার ১১টি গ্রামে হামলা চালায় যোশ এছালামী বাহীনি। স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পে জানালে আর্মিরা সহ ঝাপিয়ে পড়ে হামলা আরো ভয়ানক হয়।

৫ই মার্চ ১৯৭৯ ইং । ঘটনা স্থান গরগইজ্যাছড়ি। সেটেলার যোশ এছালামী বাহীনি ও আর্মি মিলে দুই ছাত্র ও এক কৃষককে কেটে টুকরা টুকরা করে হত্যা করে। নিহত ছাত্ররা ছিল সমীর বরন তালুকদার ও আলোময় চাকমা, আর কৃষক হলা চাকমা। কারণ হিসাবে জানা যায়, সেটেলার মুসলিম যোশ বাহীনি তাদের এলাকার গরীব অসহায় পরিবারের জায়গা দখল করতে গেলে উল্লেখিত নিহতেরা বাধা দেয়।

কাউখালী হত্যা কান্ডের ঘটনার অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন আবুল কালাম মাহমুদ ২রা এপ্রিল ১৯৭৯ ও ২৫শে মার্চ ১৯৮০ সালে পর পর দুইবার হামলা চালায় কানুনগোপাড়া গ্রামে। প্রথম হামলায় ২৯ পরিবার গৃহ হীন হয়। বাস্তু ভিটা হারিয়ে উচ্ছেদ হয়। পরের বার হামলা চালিয়ে সিন্ধু, অরুন, অনাবিল চাকমা সহ তাদের পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করে মৃত দেহে আগুন লাগিয়ে দেয়। কারণ কি ? নিহতরা প্রতিবেশীর সহায় সম্পদের উপর আঘাতের প্রতিবাদ করেছিল। সেটেলার জঙ্গী মুসলিম জন্তু গুলো তাদের জায়গা দখল করে মদরছ বানাতে চেয়েছিল। প্রতিবাদ করায় এই হত্যা।

৯ই এপ্রিল ১৯৭৯ ইংরেজী। রাঙ্গামাটিতে সেটেলারেরা ও আর্মি মিলে প্রচার করতে থাকে যে পাহাড়ী নেতারা বিভিন্ন ভাবে শান্তি বিনষ্ট করার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। আর তারই সুত্র ধরে সেই দিন প্রায় ৭৫ জন উপজাতীয় সংখ্যালঘুকে ধরে বিনা কারণে আটক করে রাখা হয় ও শারীরিক অকথ্য নির্যাতন করে ছেড়েদেয়।

পর্যায় ক্রমে চলতে থাকে হত্যা ধর্ষন উচ্ছেদ উৎপিড়ন নিপীড়ন । সংখ্যাগুরু বাঙ্গালী শ্রেনী সক্রিয় ও আড়ালে মদদ দিয়ে যায় খুনী ধর্ষক বাহীনিদের। প্রতিবাদে কেউ মুখ খুললে হয়তো গুম করে খুন নয়তো নানা প্রকারের নির্যাতন নির্ধারণ করে রাখা যে কোন একটি সাস্তি ভোগ করে প্রাণ সহায় সম্বল হারিয়েছে এমন হাজার লক্ষ মানুষের শেষ চিৎকারে এখনো আকাশ বাতাস প্রকম্পিত।

অনেক আগের পড়া। এখন ঠিক মনে করতে পারছিনা। লেখক বোধ হয় স্কটিশ নয়তো আইরিশ হবেন। একশটি খুনের ঘটনার কাহীনি লিখেছিলেন। খুন হওয়া প্রতিটি মানুষের পেছনের অতীতে তারা হয়তো সক্রিয় নয়তো কোন না কোন ভাবে কোন হত্যা খুনের সাথে জড়িত বা নিরব মদদ দাতা ছিলেন সবাই। তবে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনাও ছিল। যারা কোন ভাবেই দোষী নয়। খুব মনে পড়ে বইয়ের সারাংশ এই ভাবেই ছিল,‘‘ প্রায় সব খুনীই খুন হয়, স্বাভাবিক ভাবে মরতে পারেনা। এমনকি স্বাভাবিক মরতে গেলেও কোন না কোন ভাবে তাদের একটা সমস্যা উপস্থিত হয় বা হতে থাকে’’। এক একজন লেখক এক একটি দৃস্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা শুরু করে। কথা গুলোর বাস্তব সত্যতা প্রমান করা সহজ কাজ নয় আবার অনেক ক্ষেত্রে খুবই সহজ। পাহাড়ী অঞ্চলে জিয়া রক্তের হোলি খেলা শুরু করে সহযোগী মঞ্জুরকে নিয়ে। এই দুই জনের একজন ও স্বাভাবিক ভাবে মরতে পারেনি। আমাদের এলাকার পশ্চিম পাশের রাজাকার সিরাজ মাস্টার মুক্তি যুদ্ধের সময় অনেক খুন করেছে শুনেছি, সে মরেছে নদীতে ডুবে। আর ও একটি ঘটনা, আমাদের এলাকার বেশ কিছু পুর্ব দিকের এক রাজাকার যুদ্ধের সময় রাজাকারী করে টাকা পয়সা নিয়ে প্রাণে বাঁচতে ভারতে চলে যায় বৌ ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে। ভারতে গিয়ে মাত্র মাস দুয়েকের মাথায় গাড়ী চাপা পড়ে সে মারা যায়। মরার সময় তার বৌ বা মেয়ে কেউ জানতো না সে কোথায় তার টাকা পয়সা রেখে গেছে। ভারতে সে যেখানে তার ডেরা গেড়েছিল তাও আবার আমাদের এলাকার সংখ্যালঘুরা যেখানে বেশী ছিল সেখানে। তার মৃত্যুর পরে আইনগত জটিলতার কারণে বাড়ীটা হারায়, তার বৌ

বাসায় ঝিয়ের কাজ নেয়। তার মেয়ে এলাকার পরিচিত গনিকা হয়ে উঠে। ভারত থেকে বেড়াতে আসা অনেকের কাছেই শুনেছিলাম তার মেয়েকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো তুই কেন গনিকার কাজ করছিস, সে বলতো নাকি বাপের পাপ ধুচ্ছি। সৎ কাজই করছি। ইউরোপীয়ান সেই লেখকের সাথে একমত না হয়ে পারছি কই? যেমন কর্ম তেমন ফল তো এই জীবনেই ভোগ করতে দেখছি।

জুলুমবাজ গৃহস্থের পালিত পাগলা কুকুর জিয়াকে তারই নিকট, সমগোত্রীয় প্রতিবেশীরা খুন করার পরে পাহাড়ে কিছুটা শান্তি আসলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তারপর তারই যোগ্য সন্তান ও তাদের ঔরস জাত জারজেরা পুনঃ শুরু করে পাহাড়ে রক্তের খেলা। কোনটা নিরবে কোনটা প্রকাশ্যে। ১লা জুলাই ১৯৮৫। মহালছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ১৩তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সাজ্জাদ খুলারাম পাড়ার বিনোদ খীসার বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ হামলা চালায়। তার স্ত্রীকে খুলারাম পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে গণ ধর্ষন করে। কারণ , তার স্বামী সেটেলার কতৃক প্রতিবেশীর জায়গা জবর দখলের প্রতিবাদ করেছিল বলে।

২২শে জুলাই ১৯৮৫। লঙ্গদু থানার তিন টিলা আর্মি ক্যাম্পের সেকেন্ড লেঃ মহসীনের দলবল নিয়ে উক্ত এলাকার সব গ্রামে হামলা চালায়। এই হামলায় অংশ নেয় সমতল ভূমি থেকে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া এছালামী যোশ বাহীনি, সেটেলার যোশ ওয়ালা জন্তু ও বন্দুক বাহীনি আর্মি। হামলার কারণ : সেই এলাকায় সেটেলার জন্তূরা পাহাড়ীদের ফসল চুরি, বাড়িতে আগ্নি সংযোগ, জোর দখল করে পাহাড়ীদের জায়গায় বাড়ি ঘর নির্ন্মান শুরু করলে দুর্বল সংখ্যালঘুরা প্রতিবাদ করে, আর তার ফল স্বরুপ এই হামলা চালায়। এই হামলায় অনেক বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, লুট চালায়, খুন করে, গণ ধর্ষন করে। গন ধর্ষিতা কয়েক জনের নাম দেয়া হলো। নিভাননী ত্রিপুরা ২২ স্বামী আনন্দ ত্রিপুরা করল্যা ছড়িগ্রাম, নন্দী চাকমা ২৫ স্বামী ফিরিঙ্গা চাকমা করল্যা ছড়িগ্রাম, লিপিকা চাকমা ৩০ স্বামী রবি চাকমা করল্যা ছড়িগ্রাম, উজুদী চাকমা ২৪ স্বামী বিনোদ চাকমা বড় আঠারক গ্রাম, শান্তি চাকমা ২৫ স্বামী নাগরা চাকমা বড় আঠারক গ্রাম। একই দিনে উক্ত ব্যক্তি উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী রজনী কান্ত চাকমা ও তার বড় ভাইকে সহ আরো কিছু মানুষজনকে অমানুষিক ভাবে নির্যাতন করে। তাদের যে কয়জনের নাম বিভিন্ন রিপোর্টে আছে তা তুলে দিলাম। মহেন্দ্রমা চাকমা ৭০ , লক্ষী জয় চাকমা ১০ শান্তি জীবন চাকমা ৯ দুরায্যা চাকমা ৪৯, রসু কুমার চামকা ৫৬, কীর্তি মান

চাকমা ৩০ বাজা মোহন চাকমা ৩৪। উল্লেখিত এই মানুষগুলোকে শারীরিক নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয়নি, তাদেরকে প্রখর সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে রাখা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা।

আমার জাতিগোষ্ঠি। আমার ধর্ম গোষ্ঠির মানুষ। আমার আত্নীয়স্বজন। আমার দায়িত্ব, আমার এই অসহায় মানুষের কথা, নির্যাতনের কথা, সম্বল হারানোর কথা , হত্যা ধর্ষন গুমের কথা পৃথিবীর মানুষ জনকে জানানো। এই কথা লিখতে গিয়ে কখনো কটু কখনো অসন্তুস্টি সৃস্টি করেছি বাংলাদেশের একদল যোশ ওয়ালা এছালামী বর্বর খুনিদের ও তাদের দোসরদের । কিন্ত কি করি বাস্তব সব সময় বড় রুক্ষ হয়। এই সত্য, এই বাস্তবতা মানার বা মেনে নেবার উদর এখনো বাঙ্গালী মুসলিমের জন্ম নেয় নি। হয়তো কোন দিন জন্ম নেবেও না। মুল কথা, চোর কে চোর বললে তো সে অসন্তস্ট হবেই, খুনি বাটপার ধর্ষকদের খুনি বাটপার ধর্ষক বললেতো তারা অসন্তস্ট হবেই। সত্য যে হজম করার উদর অত্যাচারীর থাকেনা। পাহাড়ে সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করে সেখানে যাদেরকে বসানো হয়েছে তারা আসলে কারা ? তারা সারা বাংলাদেশের সাধারণ গরীব মুসলিম জনগণ যারা কখনো পাহাড়ী জীবনে অভ্যস্থ ছিলনা। পুর্বের লেখায় ও বলেছি, আবারো বলতে হচ্ছে । রাজনীতি যারা করে তারা কারা ? তাদের বিশাল অংশের পরিচয় কি ? যত ক্ষণ পর্যন্ত এই কথা মাথায় ঢুকবে না ততক্ষন পর্যন্ত ফলাফল বা কোন মতামতে আসার সম্ভাবনা একে বারে শুন্য। যাদেরকে পাহাড়ে নিয়ে যায় তারা সাধারণ এলাকা থেকে যায় যেখানে পাহাড়ী জীবন যাপন করতে হতো না। এই তারা পাহাড়ে গিয়ে প্রথমে সমস্যায় পরে খাদ্য বাসস্থান ও তাদের নিত্য দিনের উপযোগিতা নিয়ে। মুলতঃ তারা তাদের সমতল ভূমি থেকে সামান্য জায়গা জমি যা থাকে তা বিক্রি করেই পাহাড়ের সোনার খনির দিকে ছুটে যায়। গিয়ে পরে উল্লেখিত সমস্যায়। তখন তাদের পেট বাচাতে কেড়ে নিতে হয় পাহাড়ীদের ফলানো ধান, বাগানের ফসল, বসত ভিটা। এই থেকেই শুরু হয় সমস্যা, হানাহানি, রক্তারক্তি। আমার স্বজনেরা যখন এই সমস্যার প্রতিকারের আশায় আইনের কাছে যায় তখন তাদের নানা ভাবে হয়রানি করা হয়, এমনকি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নিজ বাস ভুমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হয়। অপর দিকে যোশ ওয়ালারা যখন আশ্বাস পাওয়া সরকারী সহায়তার জন্য ধর্না দেয় তখন তাদেকে প্ররোচিত করা হয় আমার স্বজনদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য। শান্তির এছালাম ধর্মের নাম ধারী প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাসী অত্যাচারীরা তাদের শান্তি দেখাতে আমার জীবন দিতে হয়, উপোস মরতে হয়। এই আশ্বাস দান কারীরা সরকারী হোক আর

বেসরকারী হোক এক একজন মানুষ। এক একটি সন্ত্রাসের প্রাণ কেন্দ্র। অথবা এই সরকার কারা ? যারা এই সরকার তারা সবাই যোশ ওয়ালা। এই যোশের কাছে সাধারণ মানুষ নিস্পেসিত, যারা আমার স্বজন, যারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু।

২৬/৮/২০০৩ এ আমি ভিন্নমতে একটি লেখা লিখেছিলাম ‘‘একটু কষ্ট করে পড়ুন’’ নামে। সেই লেখায় আমি খুব সামান্য করে বলেছিলাম, পার্বত্য শিক্ষা ও সুবিধাদি বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো। তাছাড়া, সেই লেখায় আমি শালীনতা অশালীনতা ও তাড়াহুরার কারণে মুল বিষয়ে আলোচনাও করতে পারিনাই। এই সুত্র ধরেই একটু আলোচনা করছি এখানে। পাহাড়ী অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিস্টানের সূচনা হয় ১৮৬০ সালের একটু পরে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কতটুকু শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়েছে বাংলার সরকার তা সচেতন প্রতিটি মানুষ খুব ভালো করে জানে বলে মনে করি। শিক্ষা প্রসারের বাস্তব বা অবাস্ত কোন রকমের পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কোন কালে। শুধু বিচ্ছিন্ন বাদীতা দিয়ে নীরিহ সংখ্যালঘুদের দেশ ছারা করা হচ্ছে। রাজাকার প্রধান জিয়া উপজাতীয় কোটা নামের কিছু আসন দেবার ব্যবস্থা করেছিল পাহাড়ী ছাত্রদের জন্য। মুলতঃ তার সুবিধা ভোগ করা যায়নি তেমন। বরাদ্ধকৃত সুবিধার বড়জোর ৮ থেকে ১০% সুবিধা হয়তো পেয়েছে এজাবৎ কাল পর্যন্ত। কেন এত সামান্য হবে তার নিশ্চয় কারণ জানতে চাইবে অনেকে। তাহা আমি সামান্য লিখতে চেস্টা করবো। প্রথম এই কোটা যখন শুরু হয় তখন আমলা তান্ত্রিকতার জটিলতায় তেমন কেউ সুফল পায়নি। অন্যদিকে এই কোটার বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে থাকে মুসলিম ও হিন্দু ছাত্র ছাত্রীরা। আমলাতান্ত্রিকতা ও পদলেহনের জোর দিয়ে তারাই গোপনে এই সুবিধা ভোগ করতে থাকে কয়েক বছর। আমার জানা ঘটনা থেকে দুটি বলতে চাই। ১৯৮২ সালে প্রথম ধরা পরে যে হিন্দু মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরাই উপজাতীয় কোটা ভোগ করে চলেছে। এই বছর প্রনতী রানী দাসগুপ্ত নামে এক হিন্দু ছাত্রী ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হয় উপজাতীয় কোটায়। এই খবর জানার পরে ও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ হতে থাকলে তার কিছু দিন পরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও এই বিষয়কে তথ্য হিসেবে নেয়। তার পরের বছর অথ্যাৎ ১৯৮৩ সালে ধরা পরে দুইজন মুসলিম ছাত্র। আমার যত টুকু মনে পরে জুলাই থেকে নভেম্বরের কোন এক সময় এই লেখা কোন কাগজে ছেপেছিল। এবং তাদের নাম ছিল বোধ হয় (ঠিক মনে করতে পারছিনা) কি আনছার আলী বা আস্রাফ আলী, অন্য জনের নামের শেষে ছিল মান্নান বলে মনে পরে। একজন বুয়েটে ও

অন্য জন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় উপজাতীয় কোটায়। এই বারও প্রশাসন নিরব ছিল। এমন কি এই ঘটনায় পত্র পত্রিকা ওয়ালারাও সেই খবর কে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে কাগজের কোন এক কোনায় ছাপায় সামান্য কয়েক লাইন। তাদের হয়তো ভয় ছিল এই বারও যদি মানবাধিকার ওয়ালারা তাদের খাতার তোলে বিষয়টা ? তবে বিদেশী কিছু রিপোর্টে এই তথ্য রেখেছিল। তার পরের কয় বছর এই কোটায় নাম মাত্র দুই একজন উপজাতীয় ছেলে সুযোগ পায়। - ফাকে একটি কথা বলা দরকার। এই যেমন আমি রাজাকার বাহীনি প্রধান জিয়া বলি, তেমন চোর কবি, পরকিয়াবাজ, নারী শিকারী প্রেমিক লালটু এরশাদ। আমরা যদি এই বিশেষন গুলো না লিখি তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম কি করে জানবে এই মানুষ খেকোদের কথা? কি করে জানবে বাংলার এই প্রবাদ সন্ত্রাসীদের কথা? এই লালটু এরশাদ পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে এই কোটার আরও বারোটা বাজিয়ে দেয়। তখন উপজাতীয় কোন ছাত্র ছাত্রী সেই কোটায় ভর্তি হতে হলে চট্টগ্রামের সেনানিবাসের জি ও সির বরাবরে দরখাস্ত করতে হয়। এই জি ও সি তার ইচ্ছামতো ছেলে দের চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বেশী ভর্তির সুযোগ করেদিত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে তারা আদৌ যাবে না। এমন কি এই ভর্তির লোভ দেখিয়ে অনেক ছাত্রীর সর্বনাশ ও করেছে। কোটা ভিত্তিক অনেক মেধাবী ছাত্র ছাত্রী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে এবার আমার মতামত আসে। ছাত্র ছাত্রী নেবে কোন শিক্ষা প্রতিস্টান, কোন সামরিক ছাউনির জন্য নয়। তো এই ছাত্র ছাত্রীদের সামরিক দের কাছে আবেদন করার নিয়ম করার কারণ কি ? নিশ্চয় কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। একজন ছাত্র ছাত্রীকে এটাও কি নির্যাতন নয়? তবে কি তার কারণ হিসেবে আসে না, সে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে তাকে এই নির্যাতন ? আমি যদি বলি মুসলিম মানে জন্তু , ক্ষণ কালে দুই চারজন পড়ালেখা করা মুর্খ, যোশ ওয়ালা জানোয়ারের দল তা কি বেশী বলা হয় ?

রিপোর্ট অনুসারে এমন তথ্য ও আছে ১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ির কোন এক ছেলে মেডিকেলে ভর্তি পরিক্ষায় প্রথম হয়েও তাকে ভর্তি করা হয়নি। কোটা ভিত্তিক পরিক্ষা ছাড়াই অনেক কম মেধাবী ছাত্র ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে, অথচ যারা সত্যিকারের মেধাবী তাদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়নি। ৮৫-৮৬ ও ৮৬-৮৭ শিক্ষা বর্ষে শুধু মাত্র একজন চাকমা ছাত্রকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবে কথা আসে, তাদের জন্য কিছু করবেও না, তাদের শিক্ষা প্রসারের জন্য তাদের অঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষালয় গড়ে তুলবেনা, নাগরিক সুবিধা বলতে

তাদেরকে যত তারাতারি পারে তত তারাতারি দেশ থেকে বের করে দেবার এক এক চক্রান্ত চালাতে থাকবে, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করবে, নানা নির্যাতন করবে, তো তারা যাবে কোথায়? শান্তির নামে সন্ত্রাসীদের চেহারার স্বরুপ চিনতে কি আর বাকী আছে ? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী খুনি অত্যাচারী, ধর্ষক জন্তূর দল তা কি ভুল প্রমান করার কোন পথ আছে ?

তার পরের কাহীনি আরো ভয়াবহ। রাজাকার বাহীনির অন্যতম সদস্য খালেদা সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বেশী উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ দেয়া হত, সেই ৬ টি আসন কমিয়ে তিনটিতে নিয়ে আসে। তার সাথে কিছু কিছু বিভাগীয় শিক্ষা প্রতিস্টানের কোনটাতে কোটা সুবিধা তুলে নেয় কোনটাতে সুবিধার সংখ্যা কমিয়ে দেয়। আর পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী অ-পাহাড়ী তথা বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীদের সংরক্ষিত পার্বত্য কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে পাহাড়ী ছাত্র ছাত্রীদের আরো কোনঠাসা করেফেলে। তাহলে এই সুযোগ আর রইলো কোথায় ? তো তাহলে এই এছালাম শান্তির বাহীনি! তাই না?? শান্তি যদি হয় তবে শান্তি নিয়ে পাশা পাশি বসবাস হয়না কেন? দুর্বলকে বারবার আঘাত করা এই কোন শান্তি? তাইতো বলি এছালাম যন্তদের মানবতা।

শান্তির ধর্মধারী মুসলিম যারা বলে তারা কত বড় জন্তূ, অত্যাচারী, ধর্ষক, চোর বাটপার তার আরও কিছু প্রমান দেয়া হল ঃ
২রা অগাষ্ট ১৯৮৫। খাগড়াছড়ির জেলার মহালছড়ি থানার চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় শান্তি চাকমার ১৬ বছরের মেয়ে কমলাকে সেটেলার যোশ ওয়ালারা অপহরন করে নিয়ে জোর করে মুষলমান বানিয়ে বিয়ে দেয় এক যোশ ওয়ালার সাথে। এ ঘটনা থানায় জানালেও কোন ফল না পেয়ে তার পরিবার এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পরে মেয়েটি অনেক কষ্টে নিজেকে উদ্ধার করে ভারতের শরনার্থী শিবিরে চলে যায়।
১০ই অগাষ্ট ৮৫ তৈনদং বি ডি আর ক্যাম্পের ২৪তম ব্যাটালিয়ান কোম্পানী কমান্ডার ও তার সৈন্য দল মিলে মাটিরাঙ্গা থানার বগর পাড়া গ্রামের মোহন চাকমাকে তার নিজের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। কেন করা হয় তার কোন কারণ জানা জায়নি।

১৩ই অগাষ্ট ৮৫ খাগড়াছড়ির পানছড়ি মৌজার পাহাড়ী গ্রামে সেটেলার ও ২০তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মি মিলে হঠাৎ হামলা চালায় বিধু ত্রিপুরা'র বাড়ীতে। কোন কারণ ছাড়া এই হামলায় তার

পরিবারের সবাইকে শারীরিক মারাত্নক জখম করে ও তার এক মাত্র মেয়ে শম্বুরী ত্রিপুরাকে(১৫) গণ ধর্ষন করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে চলে যায়। থানায় জানালেও কোন প্রতিকার নাই, থানা ওয়ালারা তাদের আর্মির কাছে বিচার দিতে বলে। এই নানা টালবাহানায় ও কোন বিচার না পেয়ে তারা একদিন গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়।

১৬ই অগাষ্ট ৮৫ যক্ষা বাজার আর্মি ক্যাম্পের ৩০৫তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদা তোফাজ্জল হোসেন ও সেটেলারের দল যোশ বাহীনির মিলে জুরাছড়ি থানার যক্ষা বাজারের দেবছড়ি গ্রামে জরিপ মোহন চাকমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে তার সহায় সম্বল গুড়িয়ে দেয় ও তার ১৬ বছর বয়সী মেয়ে গঙ্গল রানীকে তারই মা বাবার সামনে গণ ধর্ষন করে চলে যায়। কারণ ! কোন কারণ নাই। যোশের আগুনে উন্মাদ শান্তিকামীদের ধরনের প্রকাশ মাত্র।

১৬ই অগাষ্ট ৮৫ । দীঘিনালা সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন হারুন ও লেঃ ইনামুলের নেতৃত্বে একদল সেটেলার দীঘিনালা থানার উত্তর পুকুর ঘাট গ্রামের বিহারী চাকমা কে তার নিজের বাড়ীতে গিয়ে অসহ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। তার পা বেধে গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে মুখ ও নাকের মধ্যে পানি ঢেলে বর্বর নির্যাতন চালায়। কেন ? কারণ সে তার চাষের ফসল জোর করে নিয়ে যাওয়ায় বাধা দিয়েছিল বলে।
১৬ই অগাষ্ট ৮৫। মহালছড়ি থানার আদাম গ্রামের শিক্ষক রবি চন্দ্র চাকমা সেনাবাহিনী ও সেটেলার কতৃক পাহাড়ী গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের ধর্ষনের ও পাহাড়ীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহালছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ১৩তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর শরীফের কাছে অভিযোগ করতে গেলে তার অভিযোগ গ্রহন না করে তাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করে ও তার শরীরে গরম পানি ঢেলে দেয়।
১৭ই অগাষ্ট ৮৫। যক্ষা বাজারে ৩০৫ নং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নায়েক সুবেদার তোফাজ্জল ও কয়েকজন সেটেলার নিয়ে জুরাছড়ি থানার চোকপতি গ্রামে কালাবুয়া চাকমার ১৬ বছরের মেয়েকে ধর্ষন করে।
১৩ই অক্টোবর ৮৫। দুদুকছড়ি বি ডি আর ক্যাম্পের ২৪তম ব্যাটালিয়ানের সুবেদার কোব্বাত আলী ও সেটেলার জঙ্গী নিয়ে পানছড়ি থানার চেঙ্গী ইউনিয়নের করল্যাছড়ি গ্রামে আক্রমন চালিয়ে অনিল চাকমা ৪০, কলেজ ছাত্র লাল বিহারী চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে টাকার জন্য। পরে তাদের কাছ থেকে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ৪ হাজার টাকা নিয়ে মুক্তি দেয়।

৫ই ডিসেম্বর ৮৫। পানছড়ির কার্বারী পাড়ায় অনন্ত চাকমার মেয়ে শান্তি প্রভা ১৬ কে গণ ধর্ষন করা হয় সেটেলার ও আর্মি মিলে।

ভূষনছড়া হত্যা কান্ডের কথা ও কম বেশী সবাই জানে। এই হত্যা কান্ডও ঘটায় সেটেলার ও আর্মি মিলে। তখনো অনেক সংখ্যালঘু পাহাড়ী দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। যারা প্রাণে বেচে ভারতের মিজোরাম আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয় তাদের পরবর্তীতে জোর পূর্বক মিজোরাম ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এর পর ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ সালে লঞ্চে করে শরনার্থীদের আনার পথে লঞ্চের কেবিনে প্রায় শ'খানের মহিলা শিশু যুবতীকে ধর্ষন করা হয়। আবার কেউকে ধর্ষেনের পরে পানিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। এই ধর্ষনের শিকার হয় সাত বছরের শিশু থেকে ৪৪ বছরের মধ্য বয়সী মহিলা।

২৪শে জানুয়ারী ৮৬ । ৭ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চুরাখালী ক্যাম্পের সৈন্যরা কিছু সংখ্যক সেটেলার নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় লংগদুর গিলাতুলী গ্রামে। মনোরঞ্জন চাকমার বাড়ীতে অবৈধ অস্ত্র আছে বলে ব্যাপক তল্লাসী চালায়, তারপর তার বাড়ীতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। একই সময়ে সেটেলার ও আর্মি মিলে তার ১৫ বছর বয়সী মেয়ে অনিতাকে গণ ধর্ষন করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে। তার পাশের বাড়ীর ১৪ বছর বয়স্কা সোনাদেবীকেও গণ ধর্ষন করে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান করে ফেলে চলে যায়।

২রা ফেব্রুয়ারী ৮৬। বড়মাছড়া মরমছড়ি মুখ এলাকার আর্মি ক্যম্পের সুবেদার ও সেই এলাকার সেটেলার রজ্জাক স্থানীয় সংখ্যালঘুদের চাপ দিতে থাকে যেন তারা তাদের জীবিকায় ব্যবহারিত বলদ ও ছাগল দেয় খেতে। আর না দিতে পারলে যেন টাকা দেয়। এই জন্য কেউ কিছু না দিলে এলাকার বেশ কিছু মানুষজনকে বেধরক পিটিয়ে অজ্ঞান করেফেলে।
৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৬। মহালছড়ি থানার আর্মি ক্যাম্পের ১৩তম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ জগলুল দেওয়ানছড়ার কিছু মানুষজনকে জনসংহতি সমিতিকে সমর্থন করার দায়ে মধ্য আদামের বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৬। পার্বত্য এলাকায় সেটেলারের দ্বারা সৃষ্ট সংঘাতে বরনছড়ি আর্মি ক্যাম্পের ২৬তম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেঃ শরীফ এর নেতৃত্বে একদল সেটেলার ও আর্মি মিলে লংগদুর বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু বাড়ীঘর জ্বালিয়েদেয়। তার সাথে সাথে শিশু

যুবতি বৃদ্ধাদের গণ ধর্ষন করে। কয়েকজন ধর্ষিতার নাম : সুরমা ২৮ চন্দ্রাগন্ধা ৪৭ কালাবী ৪৫ অজলতা ২১ ও মিথা ১১।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৬ । উপরোল্লিখিত লেঃ ও সেটেলার মিলে লংগদুর পাহাড়ী তুন্যাছড়ি পেত্যাছড়ি গ্রামে হামলা চালায়। ব্যাপক হারে ধর্ষন ও হত্যা চালায় গোপনে। প্রায় ২২টির মত বাড়ী ঘর জ্বালিয়েদেয়। কেউ কেউ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক, শান্তিতে থাকুক।
(এই পর্ব অসমাপ্ত)
১০/১১/২০০৩